Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

Doi https://doi.org/10.67841/pgp.260501019

OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75

SJIF Impact Factor 3.481

Buddhadeva Bose's 'Mahabharater Katha': The Rebirth of Myth

বুদ্ধদেব বসুর 'মহাভারতের কথা': পুরাণের পুনর্জন্ম

Dr. Sulagna Banerjee
Guest Teacher
Bengali Department, Raja Narendra Lal Khan College
West Medinipur

Received on: 10th April 2026
Accepted on: 22nd April 2026

Abstract:

'Mahabharater Katha' is an unfinished yet enduringly memorable work from the twilight of Buddhadeva Bose's life. It is a composition born of the author's deliberate intent — the culmination of an inner imperative stemming from his lifelong engagement with comparative literary research and pedagogy. As Buddhadeva Bose — a man of insatiable aesthetic appetite — cultivated a rich inner world through his devoted and perceptive reading of countless books from across the globe, an irresistible urge to write began to take shape within his consciousness. It was this impulse that led him to compose 'Mahabharater Katha'. Through the lens of Yudhishthira's inner vision, he gave artistic form in this volume to the multifaceted and polyphonic nature of the 'Mahabharata' — its narratives, its characters, their inner mysteries, their conflicts, and their psychological tensions. This work is remarkable not only for its thematic depth but also for a literary style that seems to flow directly from the very depths of Buddhadeva Bose's inner being. Reading this book will enrich the literary enthusiast's mind and fill the vessel of their life; it will stir their emotions, provoke their thoughts, and leave them in deep contemplation.

Key Words:

Purposeful, resonant with birdsong, introspective, pragmatic, captivating, devoid of ambition, an underlying current.

মূল প্রবন্ধ

কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, কাব্য নাটক, আত্মজীবনী, অনূদিত কাব্য-কবিতা, শিশু-কিশোর সাহিত্য — সাহিত্যের সমস্ত শাখাতেই বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রতিভার ধারা প্রবাহিত করেছিলেন, তাঁর সাহিত্য প্রতিভার এই বহুমুখী স্রোত স্বচ্ছন্দ এবং তা আমাদের পাঠকবর্গের কাছে দুরূহ বলে বোধ হয়নি। তাঁর সাহিত্যে প্রকাশভঙ্গি স্বচ্ছ, কিন্তু তার অন্তরালে রয়েছে সাধারণ পাঠকের প্রতি গভীর মনোযোগ। স্বকীয়তা অর্জনের জন্য না তিনি নিজেকে করেছেন দুর্বোধ্য, আর না আমাদের সাধারণ পাঠকদের করেছেন অবজ্ঞা। সাহিত্যের প্রায় সব ক্ষেত্রে তাঁর অবাধ বিচরণ হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি অনন্য। প্রমথ চৌধুরী রম্য রচনার পথিকৃৎ হলেও

© Santiniketan Sahityapath

সৈয়দ মুজতবা আলী এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ বলে আমরা মানি। কিন্তু 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'র লিরিকধর্মী মনোভাব অন্যত্র নেই। বাংলা কবিতার আধুনিক ভাষা ও ভাবকে কাব্য — নাটকে প্রয়োগের অসামান্য দক্ষতা তাঁর পরবর্তীতে বাঙালি পাঠক আর পায় নি। তবু একখানি গ্রন্থ, যার জন্য সাধারণ বাঙালির কাছে বুদ্ধদেব বসু চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন — তা হলো 'মহাভারতের কথা'।

'মহাভারতের কথা' গ্রন্থটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কারণ এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে তুলনামূলক সাহিত্য গবেষণা ও অধ্যাপনার তাগিদে। এই বিষয়ে 'দু-খাতা ভর্তি নোট' নিয়ে একখানা থিসিস তৈরি হলেও হতে পারত। কিন্তু সচেতন বুদ্ধদেব আমাদের সাহিত্যেরআসরের বাইরে নিয়ে যান নি। তাই তিনি বলেছেন, "আমি যেহেতু বইখানা লিখেছি বাংলা ভাষায়, এবং মনে মনে এই উচ্চাশা পোষণ করছি যে 'সাধারণ' পাঠক পাঠিকারাও এটি পড়বেন।"[১] গ্রন্থের মুখবন্ধে একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন বুদ্ধদেব বসু। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও কাব্যগ্রন্থের; তিনি চেয়েছেন মহাভারতের মর্মকথা উপলব্ধি করতে এবং বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিতে তার ভূমিকা কতখানি তা জানতে। এর পাশাপাশি পাশ্চাত্য সাহিত্যের হোমার থেকে টলস্টয় পর্যন্ত হোক কিংবা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় সাহিত্যের বিষয়ে দেশি-বিদেশি পণ্ডিতদের মতামত বিষয়ে তাঁর বক্তব্য আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলে যে তিনি একজন অসাধারণ পাঠক। নিজেকে কিন্তু তিনি পণ্ডিত বলেন নি। বলেছেন, "আমি পণ্ডিত নই, প্রেমিকমাত্র; এই আলোচনা এক রসভোক্তার আনন্দবোধের নিঃসরণ।"[২] মহাভারতের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য যে শেষ হয়নি, দ্বিতীয় খণ্ড তাঁর পরিকল্পনায় আছে, মুখবন্ধের উপান্তে এসে জানিয়েছিলেন তিনি। শুধু যে তিনি পরিকল্পনা করে ক্ষান্ত থেকেছেন এমনটা কিন্তু নয়, জীবনের শেষ দিনেও বহুমুখী ব্যস্ততায় কাটানো মানুষ বুদ্ধদেব বসু এর দ্বিতীয় পর্ব লিখেছিলেন এমন তথ্যও পাওয়া যায় — "নানা গল্প-উপন্যাসের পাশাপাশি তখন লিখছেন 'মহাভারতের কথা'র দ্বিতীয় পর্ব।"[৩]

১৯৭৪এর মার্চ মাসে প্রথম খণ্ডের প্রুফ দেখার সঙ্গো সঙ্গো দ্বিতীয় খণ্ডের প্রস্তুতি পর্বও শুরু করেছেন, মৃত্যুর দিন সকালেও তার পরিকল্পনা হয়েছে ছাত্র সুবীর রায়চৌধুরীর সঙ্গো —

> **"দু'হাতে লিখে চলেছেন নানা ফরমায়েশি লেখা, সকালে ছাত্র ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী সুবীর রায়চৌধুরীর সঙ্গো বসে দেখেছেন 'মহাভারতের কথা' বইয়ের প্রুফ। বাকিটা বিকেলে দেখা হবে, এমন কথাও হয়ে গেছে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে।"[৪]**

কিন্তু অগ্রণী সাহিত্যস্রষ্টা বুদ্ধদেব বসুর আকস্মিক ও অকাল মৃত্যু মহাভারতের বিশিষ্ট আলোচনায় যে আলোকপাত করেছিল তাতে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তা সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এক চরম শূন্যতার সৃষ্টি করে। গ্রন্থটির সামগ্রিক আলোচনা হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু সাধারণ পাঠকদের প্রাবন্ধিক স্বয়ং যে অধিকার দিয়েছেন, তার নিরিখে আমি সাধারণ পাঠক হয়ে তাঁর বক্তব্যের পূর্ণতার দিকটিকে অনুধাবন করার চেষ্টা করব। সেই আলোচনা করতে গিয়ে আমি অবলম্বন করেছি বাংলা ভাষায় 'মহাভারত'এর রাজশেখর বসুর সারানুবাদ, কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পাদিত পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ, বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থ।

বুদ্ধদেব বসু গ্রন্থ শুরু করেছেন 'মহাভারত'এর আখ্যানের একেবারে মাঝখানে বনের ভিতরে। যেখানে পিপাসায় কাতর সহদেব, নকুল, অর্জুন ও ভীম-পঞ্চপাণ্ডবের এই চার ভাই একে একে অদূরবর্তী সরোবরে জল আনতে গেছেন। কিন্তু সেখান থেকে তাঁরা আর কেউ ফিরে আসেন নি দেখে চিন্তামগ্ন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির তাঁদের খোঁজে চলেছেন। এই কাহিনি বর্ণনা ঘটনার মাঝখান থেকে শুরু হওয়ার কারণ হলো পাঠককে কাহিনির পূর্বাপর দুই দিকেই কৌতূহলী করার প্রয়াস। বাংলা সাহিত্যে এই ধারা নবাগত। এটি মূলত ক্ল্যাসিকাল পাশ্চাত্য রীতিতে এপিক শুরুর স্বীকৃত প্রথা। হোমার তাঁর 'ইলিয়াড' শুরু করেছেন ট্রয়যুদ্ধকালে সেই নগরীকে বহু বছর ঘিরে রেখেছিল আক্রমণকারী গ্রীক শিবির-সেই ঘটনা দিয়ে। আবার 'ওডিসি' আরম্ভ করেন ট্রয়যুদ্ধ শেষে বহু বছর নিখোঁজ হওয়ার পর ঘরে ফেরার কাহিনি দিয়ে এবং নিজভূমি ইথাকায় তাঁর জীবনের বিষয়ে সংবাদহীন পুত্র টেলিম্যাকাস এবং স্ত্রী পেনেলোপির সবারুণ দশা বর্ণনায়। পরবর্তীকালে ভার্জিলের 'ইনিড' ও দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'তেও আমরা ঘটনার বর্ণনা কাহিনির মাঝপথ থেকে দেখতে পাই। ইনিডে ভার্জিল ধ্বংসপ্রাপ্ত ট্রয় থেকে ইনিয়াসের পলাতক হওয়ার বর্ণনা দিয়ে শুরু করে সিসিলি থেকে আফ্রিকা উপকূলে কার্থেজ-অভিমুখী পাড়িতে তাঁর জাহাজডুবির বিবরণ দিয়েছেন। আবার, 'ডিভাইন কমেডি'তে দান্তে নিজের জীবনব্রজের ঠিক মাঝখান থেকে প্রথম পংক্তি রচনা করেছেন। এ তো গেল পাশ্চাত্য সাহিত্যের কথা, আমাদের প্রাচীন মহাকাব্য 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' শুরু হয় শুধু

কাহিনির গোড়া থেকে নয়, একেবারে কাহিনির বীজ বপণ করা হয়েছিল যেখান থেকে। সেখানে বর্ণিত হয়েছিল রাজবংশের উদ্ভব-কীর্তি, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। মূল কাহিনিতে প্রবেশের পূর্বে তার সারসংক্ষেপ ও পর্বসংগ্রহ থেকে শুরু করে পর্ব-পরিচয় প্রসঙ্গো সম্যক ধারণা লাভ করি আমরা।

বুদ্ধদেব বসু পাশ্চাত্য রীতিকে গ্রহণ করে তাঁর মহাভারত প্রসঙ্গো সুমহান বক্তব্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। 'মহাভারত' ভারতবর্ষের মহাকাব্য-যার স্থান-কাহিনি-কালসীমা সমস্তই যেন এক পূর্ণাঙ্গ নাটকের রূপ। আর এর কাহিনিকে নির্ভর করে যেসব চরিত্র রয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই নায়কোচিত। ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, কিংবা দুর্যোধন, বর্ণ, ভীম, অর্জন, এমনকি কৃষ্ণ-প্রত্যেকেই নিজ নিজ শৌর্যে-বীর্যে-প্রাখর্যে স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার। তাই বাংলা সাহিত্যের ধারা যুগে যুগে মহাভারত ও তার চরিত্রদের নিয়ে রচিত হয়েছে কালজয়ী সৃষ্টি। মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ কাব্য নাটকে মহাভারতের জয়যাত্রা ঘোষণা করেছেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকেও আমরা মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রের ভাগ্য-জীবন-আচরণ-পারস্পরিক ও সহজাত বিদ্বেষ-শ্রদ্ধা-কৌতূহল মিশ্রিত বৈরিতা — সমস্ত অসাধারণভাবে প্রতিভাত। মহাভারতের বিশাল কাহিনিবিন্যাস ও ব্যাপক বিচিত্র চরিত্রাবলির কোলাহলপূর্ণ ব্যস্ত দৃশ্যের মধ্যে যিনি প্রকৃত কেন্দ্র — যাঁকে কেন্দ্র করে সমগ্র কাহিনির যুদ্ধ আসন্ন বা ঘটমান — তিনি ক্ষীণ নক্ষত্রের মতো, রহস্যময় ছায়ায় আবৃত — তিনি মহাবীর যুধিষ্ঠির। তিনি সকলের থেকে অনির্ণেয় দূরত্ব নিয়ে একাকী, গভীর চিন্তামগ্ন ও ভ্রাম্যমাণ। তিনিই যে মহাভারতের প্রকৃত নায়ক — তা প্রাবন্ধিক আমাদের বোধ করানোর চেষ্টাতেই প্রবন্ধটিকে বিশেষভাবে শুরু করেছেন।

মহাভারতের বিশ্লেষণে প্রথমেই আমাদের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা স্মরণে আসে। সেখানে শৌর্যে ও বীর্যে অর্জুন-ভীম, প্রতিপক্ষীয় দুর্যোধন-ভীষ্ম-কর্ণসকলের চেয়ে অধিক নিষ্প্রভ যুধিষ্ঠির। তাই প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব আমাদের অবগত করালেন, যেখানে মহাভারতের এক মৌলিক দ্বন্দ্বে অর্জুন ও ভীমের বাহুবল ও সাহস পরাভূত এবং বিজয়ী যুধিষ্ঠিরের আত্মিক শক্তি। জ্ঞান, বেদনা ও সন্ধান — এই তিন প্রধান উপাদান যুধিষ্ঠিরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বিদ্যমান। কারণ, মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে যাঁর সঙ্গো মোকাবিলা করতে হয়েছিল, তিনি শারীরিক তেজ বা বাহুবলের দ্বারা অর্জিত শক্তিধর নন, তিনি ধর্ম। বকরূপী ছদ্মবেশী ধর্মকে অগ্রাহ্য করে যুধিষ্ঠিরের অনুজেরা সরোবর তীরে প্রাণ হারান, সেখানে যুধিষ্ঠির ধর্মরাজের সকল প্রশ্নের সঠিক ও সার্থক উত্তরদানে তাঁকে প্রসন্ন করে ভাইদের পুনর্জীবন ফিরে পান। শেষে এসে বুদ্ধদেব জানালেন — "এই ঘটনাটির তাৎপর্য অনুসন্ধান করলে মহাভারতের একটি মূল রহস্য বেরিয়ে পড়বে।"[৫] এখানে প্রাবন্ধিক খুব সতর্কতায় বললেন — 'একটি মূল রহস্য'। 'মূল রহস্যটি' বা 'একমাত্র মূল রহস্য' বললেন না। কারণ, ধর্ম বিষয়ক রহস্য ব্যতিরেকে তিনি হয়তো মহাভারতের অন্য কোনো রহস্য বিষয়েও কল্পনা করেছিলেন।

পণ্ডিতদের বিচারে মহাভারতে অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ রয়েছে, কিন্তু আমরা যে-আকারে বর্তমানে মহাকাব্যের রস আস্বাদ করি, তার সামগ্রিক আলোচনাই প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসুর প্রধান কাজ। তিনি প্রক্ষিপ্ত বর্জন করে দোষমুক্ত মহাকাব্য বিচারে মনোনিবেশ করেন নি। এই সকল বৈষম্য ও বিমিশ্রতা স্বীকার করে তিনি বলেছেন — "প্রমাণের জন্য গবেষকের দ্বারস্থ হ'তে হয় না-অথবা সে প্রয়োজন আছে শুধু অন্যান্য গবেষকদের, আমরা যারা পাঠক ও ভোক্তা আমাদের নয়।"[৬] রাজশেখর বসু প্রণীত মহাভারতের সারানুবাদ যে দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত, বুদ্ধদেব বসুর 'মহাভারতের কথা, তার চেয়ে আলাদা। রাজশেখর বসুর এই সারানুবাদের প্রধান উদ্দেশ্য, "মূল রচনার ধারা ও বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব বজায় রেখে সমগ্র মহাভারতকে উপন্যাসের ন্যায় সুখপাঠ্য করা।"[৭] আসলে রাজশেখর বসু এক সত্য, যা পাঠকবর্গের দ্বারা প্রকাশ্য তা আবিষ্কার করেছিলেন। তাই গ্রন্থের ভূমিকা অংশে বলেন —

> **যাঁরা অনুসন্ধিৎসু তাঁদের দৃষ্টিতে সমগ্র মহাভারতই পুরাবৃত্ত ঐতিহ্য ও প্রাচীন সংস্কৃতির অমূল ভাণ্ডার; এর কোনও অংশই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু সাধারণ পাঠক মহাভারতের আখ্যান ভাগই প্রধানত পড়তে চান, আনুষঙ্গিক বহু সন্দর্ভ তাঁদের পক্ষে নীরস ও বাধাস্বরূপ।**[৮]

বুদ্ধদেব বসু এর বিপরীত ধারায় অগ্রসর হয়ে সাহিত্য রসপিপাসু সাধারণ পাঠকের আকাঙ্খার নিবারণ ঘটালেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে মহাভারতের জন্ম নিয়ে এক নতুন তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। তিনি বলেছেন, বৌদ্ধ ধর্মের অবক্ষয়ের পরবর্তী সময়ে হিন্দু রাজাদের হারানো গৌরব, ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের কাজে উদ্যোগী হয়ে অবিক্ষিপ্ত ও লিপিবদ্ধভাবে এক বিস্মৃতির আড়ালে থাকা ইতিহাসকে পুনর্নির্মাণ করেন। প্রাচীন বিজ্ঞরা একে বলেন 'ভারতসংহিতা'।

© Santiniketan Sahityapath

বুদ্ধদেব বসু তাঁর মহাভারতকে সংহিতায় রূপ দিয়েছেন, তাই এটি কেবলমাত্র একটি সংগ্রহ নয়। সংগ্রহ ও সংহিতার মধ্যে কিছু তফাত লক্ষণীয়। বস্তুকে সংগ্রহ করলেই তা সংহত রূপ পায় না। সংগ্রহ করা বস্তুকে যখন সাজিয়ে একত্র করি, তখন তা সংহতি পায়। তাই সংহিতায় সম্পাদক প্রধান কাণ্ডারীর ভূমিকা নেন। 'মহাভারত'এর নির্মাতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন 'ব্যাসদেব' তাই সম্পাদকের আসনে অবতীর্ণ একথা স্বীকার্য।

মহাভারতকে রাজশেখর বসু বলেছেন 'সংহিতা অর্থাৎ সংগ্রহগ্রন্থ এবং পঞ্চম বেদের ন্যায় এটি ধর্মগ্রন্থ। তিনি মহাভারতকে সাধারণ পাঠকের জন্য উপন্যাসের আকার দিলেও, বুদ্ধদেবের সঙ্গে একালের সাধারণ পাঠকের অধিকার নিয়ে মতভেদ প্রকট। বুদ্ধদেব তাঁর গ্রন্থের ভূমিকা অংশে যা বলেছেন, তা কখনোই প্রমাণ করে না যে, তিনি আমাদের কাছে এই মহাগ্রন্থকে উপন্যাস হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন।

'এক অন্তহীন অরণ্য' অংশে বুদ্ধদেব এক জার্মান পণ্ডিতের বক্তব্য জানিয়েছেন, যিনি মহাভারতকে কোনো অন্তহীন ভারতবর্ষীয় অরণ্যের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, বহু বৃক্ষ-লতা-গুল্মবিজড়িত, বিহঙ্গধ্বনিমুখরিত এবং নানারকম শ্বাপদ ও সাপ-সংকুল বিস্তীর্ণ অরণ্যের মধ্যে পাঠক দীর্ঘ সময় ধরে বিস্ময়ের সঙ্গে চলতে পারে, কিন্তু কখনো উত্তীর্ণ হতে পারে না। অর্থাৎ, সেই মহারণ্যে পথ নেই।

মহাভারতের এই রূপকল্পনাকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন বুদ্ধদেব। আমরা তাঁর মধ্যে কোনো হতাশা দেখি না। তিনি মনে করেছেন পথ যতই দুর্গম হোক, প্রতিটা ক্ষেত্রে তার নিজস্ব সৌন্দর্য রয়েছে। যেমন, ডুয়ার্সের সৌন্দর্য একরকম, আবার সুন্দরবনের রূপ আরেক রকম। তাই মহাভারতের চরিত্র বুদ্ধদেব আগে বুঝে নিতে চেয়েছেন। তিনি এর বিস্তারের মধ্যে দিয়ে এমন সূত্র আবিষ্কার করেছেন, যা এর প্রকৃতিকে খণ্ডন করে না। তাই রাজশেখর বসু-কৃত সারানুবাদকে সম্মান জানিয়ে বুদ্ধদেব কৃতজ্ঞচিত্তে বলেছেন — "কোনো সংক্ষেপীকরণ যতই না তৃপ্তিকর হোক, তা কখনো পর্যাপ্ত হ'তে পারে না; তা থেকে যা কিছু বর্জিত হয়েছে তা-ই আমাদের পক্ষেও পরিত্যাজ্য নয়, এই কথাটি মনে রাখা চাই।"[৯]

বুদ্ধদেবের কাছে মহাভারত শুধুমাত্র যুদ্ধবৃত্তান্ত নয়। তিনি লক্ষ করেছেন, 'মহাভারত'এর মূল কাহিনি তার প্রতিটা পর্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এর 'মহান পরিকল্পনা'র মধ্যে তিনি এক 'বদ্ধমূল অভিপ্রায়' দেখেছেন। তা প্রত্যক্ষে কখনো কখনো বদ্ধমূল হলেও পরোক্ষে ক্রমাগত সৃষ্টিশীল। এবং তারই মধ্যে গ্রথিত রয়েছে 'মহাভারতের ঐক্য'। প্রাবন্ধিক 'মহাভারত' পাঠ করে উপলব্ধি করলেন, যুধিষ্ঠির মহাভারতে এমন এক চরিত্র, যাঁর সামগ্রিক বিকাশ সমগ্র মহাভারতের উদ্দেশ্য, চরিত্র, সূচনা ও পরিণতি-সমস্ত আমাদের বুঝতে সাহায্য করে। যুধিষ্ঠিরের নায়কত্ব প্রকাশে প্রথমেই প্রাবন্ধিক আমাদের বক বা যক্ষ রূপে মূর্ত ধর্মের প্রশ্ন সম্মুখীন পঞ্চপাণ্ডবের আখ্যান বলেছেন। তারপরে সমগ্র প্রবন্ধ গ্রন্থ জুড়ে মহাভারতের সব প্রসঙ্গেই যুধিষ্ঠিরের সম্পর্ক এবং উভয়ের সহমুখী অগ্রগতি বুদ্ধদেবের প্রধান প্রতিপাদ্য।

ধর্ম-অধর্ম-স্বধর্ম নিয়ে যখন সমগ্র মহাভারত দোলাচল, তখন তাদের মধ্যে পথ করে চলেছেন যুধিষ্ঠির। তাঁর হাত ধরেই আমরা এই মহা অরণ্যের শৃঙ্খলামোচনে সার্থকতা লাভ করব, তার সঙ্গে এই অরণ্যে উত্তীর্ণ হওয়ার পথও আবিষ্কার করতে পারব। আমাদের মনে হতে পারে, নিজের অজান্তে প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু কী সমগ্র মহাভারতকে দেখবার উদ্দেশ্য থেকে সরে এলেন? না কী এই মহাগ্রন্থকে একটি মানবচরিত্রের সাপেক্ষে নৈতিক প্রশ্নের উত্তর বিধানে সচেষ্ট রেখে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন? অথবা, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিকল্পনাকে সার্থকতা দানে কোনো দ্বিতীয় খণ্ডের ভাবনা প্রাবন্ধিক আগেই করেছিলেন?

বুদ্ধদেব ইউরোপীয় দুই আদিম ও লৌকিক এপিক 'ইলিয়াড' ও 'অডিসি'র সঙ্গে, এমনকি বাল্মীকি 'রামায়ণ'এর সঙ্গেও তুলনা করে বিচার করেছেন — "মহাভারতের সমগ্রতায় ছোঁয়ানো মাত্র তা চূর্ণ হ'য়ে যায়।"[১০] আমরা জানি, 'রামায়ণ', 'মহাভারত'এর মতোই 'ইলিয়াড', 'অডিসি' নানা পুরাণকথা ও লোককথাকে আশ্রয় করে রচিত। এই সমস্ত গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন যুগের, নানাপ্রকার আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা লক্ষ করেছেন। এইসব প্রক্ষিপ্ত কাহিনির মধ্যে হোমার নামক কেউ ছিলেন কিনা সে বিষয়েও মতভেদ রয়েছে। তবু একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, এই ধরণের এপিকের কাহিনি-পরিকল্পনা, বিষয়-নির্বাচন ও নির্মাণের আদব-কায়দা কোনো বিশেষ সম্পাদক বা নির্মাতার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। 'রামায়ণ', 'মহাভারত' প্রসঙ্গেও একথা প্রযোজ্য।

© Santiniketan Sahityapath

বিষয়গত দিক থেকে প্রাচীন এই মহাকাব্যগুলি বিশেষ মাত্রায় উন্নীত ও পৃথক। ‘রামায়ণ’ ও ‘অডিসি’ চরিত্রভিত্তিক নামকরণের দাবিদার, একক চরিত্রকে ঘিরে এই মহাকাব্যদ্বয় রচিত। রামের অয়ন ‘রামায়ণ’, অডিসেউসের বৃত্তান্ত ‘অডিসি’। সেদিক থেকে ‘ইলিয়াড’ ট্রয়ের যুদ্ধকথা ও ‘মহাভারত’ ভ্রাতৃবিরোধ ও ধর্মপ্রতিষ্ঠান নিয়ে রচিত। তাই ‘অডিসি’ এবং ‘রামায়ণের’ সমস্যা কখনোই তাদের নায়ককে বা তার ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করে না। কিন্তু ‘ইলিয়াড’ বা ‘মহাভারত’এ এই প্রসঙ্গ আসে না।

বুদ্ধদেব বসু যুধিষ্ঠিরকে মহাভারতের নায়ক বলে ঘোষণা করেছেন যদিও রাজশেখর বসু তাঁর আগেই যুধিষ্ঠিরকে মহাভারতের‘কেন্দ্রীয় পুরুষ’ বলেছিলেন। প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক আমাদের জানিয়েছেন — “আমি কোনো নতুন কথা বলছি না; রাজশেখর বসুও তাঁর সারানুবাদের ভূমিকায় মহাভারতের নায়ক ও কেন্দ্রস্থ পুরুষরূপে যুধিষ্ঠিরকেই চিহ্নিত করেছেন।”[১১] যুধিষ্ঠিরের নায়কত্ব বর্ণিত আছে রূপকের মাধ্যমে মহাভারতের উপক্রমণিকাতে। সেখানে দুর্যোধন ক্রোধে উন্মত্ত বৃক্ষ, কর্ণ তাঁর সহচর স্কন্ধ, শকুনি তাঁর শাখা, দুঃশাসন ফল ও পুষ্প, রাজা ধৃতরাষ্ট্র মূল। অপরদিকে যুধিষ্ঠির ধর্মময় বৃক্ষ, স্কন্ধ অর্জুন, শাখা ভীম, নকুল-সহদেব ফল ও পুষ্প, কৃষ্ণ-ব্রহ্ম-ব্রাহ্মণগণ হলো মূল। এই রূপকের দ্বারাই যুধিষ্ঠির ধর্মময় মহাবৃক্ষরূপে পাণ্ডবদের ধারণ করছেন। তাঁর মূল নিহিত তিন উৎসে। ব্যক্তিনাম একজনেরই পাওয়া যায় — তিনি কৃষ্ণ।

বঙ্কিমচন্দ্র এই কর্মময় মহাবৃক্ষের উৎস সন্ধানে কৃষ্ণচরিত্রের হদিশ পেয়েছিলেন। মহাভারতের পৌরাণিকতাকে বর্জন করে ঐতিহাসিকতার প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন। পুরাণের অতিকথার বেড়াজাল থেকে ঐতিহাসিক কৃষ্ণ চরিত্রকেও মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তিনি কৃষ্ণকে সমাজসংস্কারক হিসেবে দেখতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষে ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে। যেখানে সাধুরা পাবে শান্তি-স্বস্তি, দুষ্কৃতীরা পাবে শাস্তি; শাসন-আইন হবে বলবৎ, হিংসার স্থান সেখানে থাকবে না। এমন এক রাজ্য কামনা করেছিলেন কৃষ্ণ। কংসের অত্যাচারে, জরাসন্ধের বিকৃত ক্ষমতালোভ, শিশুপালের অনৈতিক বিদ্রোহ থেকে মুক্ত করে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য দায়ভার কৃষ্ণ তুলে দিয়েছিলেন যুধিষ্ঠিরের হাতে। বহুজনের সুখের হেতু নির্মিত রাজধর্মই হলো কৃষ্ণের প্রকৃত ধর্ম। এর প্রতিষ্ঠার জন্য সাম-দান-দণ্ড-ভেদ কোনো বিষয়েই তিনি কুণ্ঠিত নন। ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা কৃষ্ণ নিজেকে সর্বৈব প্রমাণ না করে যুধিষ্ঠিরকে সেই আসনে বসিয়েছেন, তাতেই কৃষ্ণের মহত্ত্ব প্রকাশিত।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ‘কৃষ্ণচরিত্র’তে কৃষ্ণের অতিকথা ও বাস্তবতা — দুইটি বিষয়েই আলোকপাত করেছেন। প্রেম ও যুদ্ধজয়ে কোনো অন্যায় বা কপটতার আশ্রয় নেন নি কৃষ্ণ। তা বঙ্কিমের সনাতন ধর্মবোধ ও উনিশ শতকীয় নীতিবোধ মেনে নেয়নি। তাই মহাভারত থেকে কৃষ্ণের আদর্শ মানবমূর্তি গ্রহণ করে প্রক্ষিপ্ত অংশের দেবত্ব-প্রকাশের মহিমাকে বর্জন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বুদ্ধদেব বসুও মহাভারতের ধর্মের দুটি গতির কথা স্বীকার করেছেন। একটি বহির্মুখী ও অপরটি অন্তর্মুখী। বহির্মুখী গতি পরার্থে চিত্রিত, কিন্তু অর্ন্তমুখী গতি নিজের বিষয়ে ভাবিত। যুধিষ্ঠিরের ধর্ম ব্যক্তিগত আর সমষ্টির চিন্তায় মগ্ন কৃষ্ণ। মহাভারতের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত যুধিষ্ঠিরের ক্রিয়া এবং কৃষ্ণের গতি কর্মকাণ্ডকে নির্দেশ করে। সেই অর্থে ব্যক্তিগত নৈতিক ধর্ম-জিজ্ঞাসাতেই ‘মহাভারত’ থেমে থাকেনি। এই মহাগ্রন্থের প্রথম পর্যায়ের সূত্রধর যুধিষ্ঠির, দ্বিতীয় অংশের সারথি কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ তাঁর ধর্মরাজ্যে সর্বেসর্বা হিসেবে যুধিষ্ঠিরকে নির্বাচন করেন। কিন্তু নির্মাতা নন যুধিষ্ঠির। নির্মাণের জন্য কৃষ্ণের সহযোগী অর্জুন ও ভীম। অর্জুন কৃষ্ণের প্রাণসখা, তাই তাঁকে আমরা কৃষ্ণের দক্ষিণ বাহু হিসেবে দেখি। আত্মানুসন্ধানী যুধিষ্ঠির জগতের প্রায়োগিক ক্ষেত্রে দুর্বল ও অব্যবস্থিত চিত্ত হলেও প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রগতিকে মানব চরিত্রের উর্দ্ধতন হিসেবে বিচারের পাশাপাশি মুগ্ধও হয়েছেন। যুধিষ্ঠিরের দ্যূত ক্রীড়ায় অত্যাসক্তির কারণেই তাঁর নিজেরও পরিবারের সকলের সর্বনাশ ঘটে। যখন যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রোণাচার্যকে নিধনের জন্য তার মনোবল ভাঙতে যুধিষ্ঠির বললেন, ‘অশ্বত্থামা হত’ এবং ‘ইতি গজ’ অব্যক্ত রাখলেন, তখনই তাঁর জীবনের চরম স্খলন ঘটে গেল। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, এমন বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যা প্রবঞ্চনা আসলে গুরুহত্যা করার জন্য নরক যাওয়াই একমাত্র উপযুক্ত দণ্ড, কেবলমাত্র নরক-দর্শন যথেষ্ট নয়।

কৃষ্ণের পরামর্শে যুধিষ্ঠিরের এই পতন। অর্জুনকেও এই মিথ্যা বলার পরামর্শ দান করে কৃষ্ণ, কিন্তু অর্জুন অসম্মত হয় তাতে। দুর্বল চিত্ত যুধিষ্ঠিরের মনে বিষের বীজ বপণ করে কৃষ্ণ অসৎ উপদেশ প্রদান করে ক্ষান্ত হন নি; প্রাণরক্ষার জন্য, কামিনীর জন্য, বিবাহের জন্য এবং গো-ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্যে মিথ্যা কথনে পাপ নেই — এই কুযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মিথ্যা বলতে যুধিষ্ঠিরকে বাধ্য করলেন কৃষ্ণ।

© Santiniketan Sahityapath

বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র মহাভারতকে ব্যাখ্যার জন্য কৃষ্ণচরিত্র লেখেন নি, লিখেছিলেন কৃষ্ণ চরিত্র বোঝার জন্য। অপরদিকে সমগ্র মহাভারতের মূল জিজ্ঞাসাকে বোঝার জন্য যুধিষ্ঠিরের সমগ্র চরিত্রকে বোঝার দরকার ছিল বুদ্ধদেবের। নিজের ঔপন্যাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপন্যাসের প্রথায় ওই কেন্দ্রস্থ চরিত্রের একক মানসিক বিবর্তনে প্রাবন্ধিকের মনোযোগ। মহাভারতের কর্মকাণ্ডের প্রকৃত নায়ক কৃষ্ণের মানবচরিত্র সম্বন্ধে তিনি নির্দ্বিধায় বলেছেন —

> **কৃষ্ণ এখন আমাদের চোখে একজন মানুষ মাত্র-অসাধারণ মানুষ তা সত্য, কিন্তু ইতিহাস-শ্রুত অন্য অনেক অসাধারণের মতোই স্খলনপ্রবণ — অন্তত পুণ্যপ্রভ বা শুদ্ধশীল তাঁকে বলা যায় না — কেননা যুদ্ধকালীন তাঁকে বলা যায় না — কেননা যুদ্ধকালীন নিকৃষ্টতম কর্মগুলি তাঁরই দ্বারা সাধিত বা প্ররোচিত হয়েছিলো।**[১২]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিত্রে কৃষ্ণের ধর্ম-বিষয়ে বিচার করতে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে গুরুত্ব দেননি, আর বুদ্ধদেব যুধিষ্ঠিরের প্রতি মনোনিবেশ করে কৃষ্ণের ধর্মকে অবহেলা করেছিলেন। তার সঙ্গে মানব কৃষ্ণকে যুদ্ধজয়ের জন্য কুপরামর্শ দানে নরকধামে পাঠিয়ে শান্তি পেয়েছিলেন বুদ্ধদেব। মহাভারতের যুধিষ্ঠির ব্যক্তিগতভাবে একেবারেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না, এর পরিচয় আমরা বনপর্বে পাই। তিনি স্বয়ং জানান, অপ্রবাসী, অঋণী এবং শাকান্নভোজী জীবনের সুখই তাঁর প্রার্থিত। অন্যদিকে হোমার তাঁর 'অডিসি'তে দুঃসাহসী অভিযাত্রী অডিসেউসের কাহিনিতে ছেদ টেনেছেন নায়কের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন, স্বগৃহে ইথাকায় নিজের স্ত্রী বেনেলোপির সঙ্গে সুখে পালঙ্কে সুখ নিদ্রায়। এই বিপরীত পরিণতি এমনতর বিপরীতধর্মী নায়কের ক্ষেত্রে চিত্তাকর্ষক।

অডিসিতে আমরা বুঝতে পারি, অডিসেউসের যাত্রাপথের পরিসমাপ্তি হোমার মহাকাব্যের মধ্যেই আমাদের দিয়েছেন। ইথাকায় মিলনান্তিক পরিণতির পরেও তার যাত্রাপথ শেষ হয় না, বৃদ্ধ বয়সে তাকে আবার বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়তে হয়। কিন্তু এবারে সে যাবে সমুদ্রের বিপরীত মুখী স্থলপথে। নৌকার একটি দাঁড় কাঁধে নিয়ে চলতে হবে তাকে। যে দেশের মানুষ নৌকা বিষয়ে অবগত নয়, সেই দেশে গিয়ে তাকে থামতে হবে। সেখানে সমাপ্ত হবে তার ভ্রমণ। দেবতাদের উদ্দেশে পূজা ও বলি নিবেদন করে তখন ঘরে ফিরতে পারবে সে। তখন সমুদ্রের বাতাস তার জন্য বয়ে আনবে শান্তি ও মৃত্যু।

বুদ্ধদেব টাইরেসিয়াসের ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা সমুদ্রের বাতাসবাহিত অডিসেউসের শান্তি ও মৃত্যুর কথা উল্লেখ করলেও, হোমার-কথিত অডিসেউসের শেষযাত্রার কথা তিনি উল্লেখ করেন নি। সে যাত্রার কথা ভাবলে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে অডিসেউসের পরিণতির বৈপরীত্য কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে পড়ে, কারণ দুজনেই শেষযাত্রার ঘর ছেড়েছিলেন শান্তির সন্ধানে। এর পরিবর্তে বুদ্ধদেব তৃপ্তিহীন অডিসেউস বা ইউলিসিসকে নিলেন অশান্ত সাগরযাত্রায়। জ্ঞানের সন্ধানে ইউলিসিস ঘর ছেড়েছে, ঈশ্বরের নিষেধ অগ্রাহ্য করে। যুধিষ্ঠিরের ঈশ্বরমুখী শেষযাত্রার বিপরীতে ইউলিসিসের ঈশ্বর-অমান্যকারী অন্তিম অভিযান এক চিত্তাকর্ষক বৈপরীত্যের সৃষ্টি করেছে। শাতন ও সীবনের সাহায্যে গড়া বৈপরীত্যের রূপের সম্পাদনের কলাতেই বুদ্ধদেব মহাভারতের মর্মতলের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের অন্তরাত্মাকে মিলিয়েছেন। তাই মহাভারতের মুগ্ধতায় প্রাবন্ধিক বলেছেন —

> **একদিকে এই পৌরাণিক ঐশ্বর্য, অন্যদিকে এক বদ্ধমূল ধর্মবোধ, ভালো-মন্দের বিচারে ক্লান্তিহীন ও বিচিত্র অধ্যবসায়-এই দুটো দিক মিলিয়ে দেখলে মহাভারত একটি নতুন পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিভাত হয়। তখন দেখতে পাই, হোমার ও হেসিয়দ থেকে আরম্ভ করে, আথেনীয় নাট্যকারদের পেরিয়ে, অভিদ ও ভার্জিলকে স্মরণ রেখে দান্তে পর্যন্ত পৌঁছলে আমাদের মানসপটে যা অঙ্কিত হয়, মহাভারত সেই সুদীর্ঘ ভাবরেখারই সমান্তর।**[১৩]

এই সমান্তরাল রেখা ঐতিহাসিক বাস্তবতার বহির্জগতে পৌঁছায় না, এটি একান্তভাবে দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করে রাখে — একথা বুদ্ধদেব গ্রাহ্য করেন নি। তাই জন্মান্তরবাদ যে মহাভারতে প্রকাশিত ধর্মের সঙ্গে দান্তের খ্রিস্টিয় ধর্মের থেকে নিকটতর তা তিনি মনে রাখলেন না। এসব সত্ত্বেও বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'মহাভারতের কথা' প্রবন্ধে মহাভারতের ঘটনা ও যুধিষ্ঠিরের চেতনার ক্রমবিকাশকে অতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

বুদ্ধদেব বসুর মতে, 'মহাভারত'এর কেন্দ্রস্থ পুরুষ চরিত্র যুধিষ্ঠির নরদেহে অবতীর্ণ ভগবান নন, শ্রীকৃষ্ণ বা রামচন্দ্রের ন্যায়; কোনো আদর্শ বীর চরিত্রের বলেও তাঁকে স্মরণ করা যায় না। তাঁর অনেক চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি, দৌর্বল্য ও স্খলনের দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি। কিন্তু দুটি গুণের জন্য তিনি অনন্য-সত্যনিষ্ঠা ও জিজ্ঞাসু মন। এই দুই গুণের ধ্বজাধারী যুধিষ্ঠির চরিত্রসকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে

© Santiniketan Sahityapath

নিজেকে সসম্মানে উদ্ধার করে নতুন পথের সন্ধানে ব্রতী থেকেছেন আজীবন। সমগ্র জীবন ধরে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং নিজের চেতনাবোধকে ক্রমাগত ঋদ্ধ ও আরোহী করেছেন। প্রাবন্ধিকের মতে, সমগ্র 'মহাভারত' যুধিষ্ঠিরের চেতনার আরোহণের বিবরণ। বনপর্বের সমস্তটা জুড়েই তিনি শিক্ষার্থী, এই বনপর্ব থেকেই তাঁর ব্যক্তিত্বের ক্রমপ্রকাশ ও ক্রমবিকাশের সূত্রপাত। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসভায় তিনি যা পাননি, প্রকৃতির কোলে মুনি-ঋষিদের সান্নিধ্য তাঁকে তা দিয়েছিল — সেটা প্রকৃত শিক্ষা; প্রকৃতির বুকে খুঁজে পেয়েছিলেন যুধিষ্ঠির প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়। সেই শিক্ষা থেকে তিনি জীবনের বিষয়ে যে-সত্য আহরণ করলেন, তা-ই ব্যক্ত করলেন বনপর্বের অন্তিম অংশে, বক বা যক্ষরূপী ধর্মের প্রশ্নের উত্তরে। তাই বনপর্বের ঘটনাবলি যথার্থও প্রাসঙ্গিক; এই প্রাসঙ্গিকতা আভ্যন্তরীণ ও মনস্তাত্ত্বিক। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বলেছেন — "বনপর্বে কোনো ঘটনামূলক অভিপ্রায় নেই; যদি বা থাকে সেটা প্রকট নয়, অভ্যন্তরীণ, যান্ত্রিক নয়, মনস্তাত্ত্বিক এবং সেটা যুধিষ্ঠিরেরই জীবনী সংক্রান্ত, অন্য কারো নয়।"[১৪] এখানে বক, বৃহদশ্ব, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মুনিদের দীর্ঘ কথোপকথনের প্রধান জিজ্ঞাসু ছিলেন যুধিষ্ঠির। বৃহদশ্ব মুনিকে যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় নিজের সর্বস্ব হারানোর বিবরণ জানিয়ে প্রশ্ন করেন তাঁর মতো হতভাগ্য পৃথিবীতে আর কেউ আছে কি না। এর উত্তরে বৃহদশ্ব যুধিষ্ঠিরকে নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান বললেন ও জানালেন কীভাবে রাজা নল পাশাখেলায় তাঁর ভাইয়ের ছলনায় হেরে সস্ত্রীক বনবাসী হন। এখানে নলের দ্বারা দময়ন্তী ত্যাগ এবং দ্রৌপদী ও ভ্রাতাদের জন্য যুধিষ্ঠিরের বেদনাবোধ — এই দুয়ের মধ্যে স্পষ্ট বৈপরীত্য লক্ষ করেছেন প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু। এইভাবে বনপর্বের আখ্যানের সঙ্গো যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন ও চরিত্র প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে।

অরণ্যে যুধিষ্ঠির যে শান্তির প্রত্যাশা করেছিলেন, তা যুদ্ধবিদ্যা বা রাজধর্মকে আশ্রয় করে লাভ করেন নি; তার মূলসূত্র খুঁজে পেলেন অনৃশংসতায়। আসলে এই শিক্ষা ছাড়া ধর্মের অন্য পথ তিনি দেখতে পান নি। ধর্ম যখন প্রশ্ন করেন পথ কী? তখন যুধিষ্ঠির উত্তরে বলেন — এই তর্কের মীমাংসা নেই, বেদ বা শাস্ত্রজ্ঞান বিভিন্ন, এমন কোনো ঋষি নেই যাঁর মত প্রামাণিক, ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত, মহাপুরুষেরা যে পথ অবলম্বন করেছে সেটাই পথ। ঋণমুক্ত, অপ্রবাসী, শাকান্নভোজনে জীবনের শান্তি-সন্তুষ্টি আছে বিশ্বাস করে ও কামনা করে বেশির ভাগ মানুষ। যুধিষ্ঠিরও সেই সরল গার্হস্থ্য জীবন চেয়েছিলেন। তিনি সন্ন্যাসের মাধ্যমে মোক্ষলাভ বা যুদ্ধের দ্বারা রাজ্যলাভ — কোনোটাই কামনা করেন নি বনপর্বের শেষে।

দুর্যোধনের হিংস্রতায় যুদ্ধ যখন আসন্ন, তখন যুদ্ধ থামানোর জন্য ও বিরোধ না হওয়ার চেষ্টায় যুধিষ্ঠির পাঁচ ভাইয়ের জন্য পাঁচটি মাত্র গ্রাম ভিক্ষা চান। কিন্তু এর জন্য যুধিষ্ঠিরকে আমরা যুদ্ধভীরু ভাবতে পারিনা। যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে দুর্যোধনের দূত সঞ্জয়ের কাছে সাবধানবাণী ঘোষণা করেন —

> **তুমি জেনো, সঞ্জয়, ধার্তরাষ্ট্রগণ শুধু ততদিনই জীবিত থাকবে যতদিন কানে না-শুনবে অর্জুনের জ্যা-নির্ঘোষ, দুর্যোধন সুখের আশা করতে পারবে শুধু ততদিন, যতদিন সে ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে চোখে না-দেখবে। ভীম, অর্জুন ও দুই মাদ্রীপুত্রকে জয় ক'রে ইন্দ্রও আমাদের রাজ্য নিতে পারবেন না।... যদি দুর্যোধন আমাদের অর্ধেক রাজ্য ফিরিয়ে দেয় তবেই আমি সন্ধিতে সম্মত আছে, নচেৎ নয়।**[১৫]

তাই মৃদু ও দারুণ উভয় সম্ভাবনাতেই যে তাঁরা প্রস্তুত এই ভাষণেই সে কথার আভাস প্রদান করেছেন যুধিষ্ঠির।

যুদ্ধে তৎপরতাহীন, নিরভিলাষ, নিরীহ অথচ নির্ভীক এই মানুষটিকেই ব্যাসদেব ধর্মযুদ্ধের শীর্ষে রেখেছেন। এর ব্যাখ্যায় আমরা যুধিষ্ঠিরের দুই বিপরীত সত্তার সহাবস্থান প্রত্যক্ষ করি। প্রথমত যদি যুধিষ্ঠিরের ব্যক্তিচেতনার ঊর্ধ্বর্তনের পর্যায় দেখি, তাহলে মনে হবে যুদ্ধ কখনোই সে-চেতনার কোনো চূড়ান্ত স্থিতি নেই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দিয়ে তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ সম্ভবপর নয়। যুধিষ্ঠির-চরিত্রের নিরিখে বুদ্ধদেব মহাভারত প্রসঙ্গো বলেন —

> **তা নিছক যুদ্ধ-বৃত্তান্ত নয়-কোনোমতেই নয়; কোনো রুধিরাক্ত নিবেলুঙ্গোন গাথার হিন্দু প্রকরণরূপে মহাভারতকে কল্পনা করা অসম্ভব। যদি কুরুপাণ্ডবের সংঘর্ষই মূল কাহিনী বলে নির্দিষ্ট হয়, তাহলে তো আদিপর্বের শেষার্ধ, সভাপর্ব, উদ্যোগপর্ব আর গীতাবর্জিত ভীষ্মপর্ব থেকে সৌপ্তিক পর্যন্ত পাঁচটি পর্বকে সংক্ষেপিত করে নিলেই আমরা 'বিশুদ্ধ' মহাভারতটিকে হাতে পেয়ে যাই, অন্য সবই অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। কিন্তু এ-ভাবে সম্পাদিত হলে, নির্ভয়ে বলা যায়, এই ভারত-কথাটি ভারতবর্ষীয় জীবনযাত্রার বাইরে প'ড়ে থাকতো।...** [১৬]

© Santiniketan Sahityapath

অন্যদিকে যুধিষ্ঠির চরিত্রকে বাদ দিয়ে মহাভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও ধর্মে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন ভারতকে সংহত করার জন্য এবং এক মহান ভারত সৃষ্টির জন্য ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নেন। আর প্রতিষ্ঠিত ধর্মরাজ্যের শীর্ষে এমন এক সম্রাটের কথা ভাবা হয়, যাঁর চরিত্রের ভিত্তিমূল হবে সরলতা ও সত্যনিষ্ঠা, ঠিক যেমনটা আমরা পাই যুধিষ্ঠিরের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে যুধিষ্ঠির এবং কুরুক্ষেত্র উভয়ই মহাভারতের অত্যাবশ্যকীয় অংশ।

সে-যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ বলে তা থেকে কৃষ্ণ বা গীতাকেও কোনোমতে বর্জন করা সম্ভব নয়। তবে ‘কৃষ্ণচরিত্র’ প্রণেতা বঙ্কিমচন্দ্র নিজে মহাভারতের জন্য যুধিষ্ঠিরের প্রয়োজন অনিবার্য, তা উপলব্ধি করেন নি। বুদ্ধদেব মনে করেছেন, যুধিষ্ঠির তাঁর নিজের মুখে যুদ্ধের অনুমতি প্রদানকালেই তাঁর মানসিক ধৈর্য্য, স্থৈর্য ও শান্তি হারিয়েছিলেন। যখন তিনি যুদ্ধের ন্যায় ভয়ানক কর্মেলিপ্ত হলেন, তখন থেকেই তাঁর চারিত্রিক স্খলনের সূত্রপাত। তাই বুদ্ধদেব বলেছেন —

> **দুঃসহ নিশ্চয়ই, আমাদের পক্ষে প্রায় অভাবনীয়-এই যুদ্ধকালীন ‘ধর্মরাজ’ যুধিষ্ঠির। যদি যুদ্ধবিরতির সঙ্গে-সঙ্গেই মহাভারত সমাপ্ত হতো তাহলে, সন্দেহ নেই, যুধিষ্ঠির এক ভণ্ডচূড়ামণি ব’লে চিরকালের মতো চিহ্নিত হ’য়ে থাকতেন।**[১৭]

যুদ্ধের পরিণতি দেখে প্রাবন্ধিক উপলব্ধি করেন, যুধিষ্ঠিরের এহেন দুষ্কর্ম যথোচিত ও সুসংগত, কারণ তাঁর জীবনে এগুলির প্রয়োজন ছিল। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সঞ্জাত মর্মবেদনাই যুধিষ্ঠিরকে সাহায্য করে ঊর্ধ্বতর আরোহণ। ক্ষত্রিয় হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রের বহির্ভূত জগতে থাকাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তা করলে নৈতিকভাবে তিনি কাপুরুষোচিত আচরণ করতেন। সেই ক্ষেত্রে তাঁর চরিত্রের এক উত্তরণহীন পতন ঘটত।

যুধিষ্ঠির চরিত্রে যুদ্ধ পরবর্তী কর্মকাণ্ডে অনিবার্যভাবে এসে পড়ে ‘গীতা’র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যদিও আমরা জানি গীতার কথোপকথন কেবলমাত্র কৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু গীতার শুরুতেই কৃষ্ণ আমাদের যে নিষ্কাম ধর্ম ও স্বধর্ম বিষয়ে ধর্মের সংজ্ঞায় বলেছেন, তার আভাস আমরা পূর্বে যুধিষ্ঠিরের মুখে শুনেছি — তিনি ফলাকাঙ্খী হয়ে কোনো কাজ করেন না। হ্রদ-প্রান্তিক পরীক্ষাকালীন তিনি আবার বলেছিলেন স্বধর্মে নিষ্ঠার নামই তপস্যা এবং স্বধর্মে স্থিরতাই স্থৈর্য। কৃষ্ণের স্বধর্ম আর যুধিষ্ঠিরের স্বধর্মের মধ্যে পার্থক্য আছে। কৃষ্ণ বর্ণাশ্রমে কথিত ধর্মকেই স্বধর্ম বলেছেন। এতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের নিজ নিজ বৈধ ধর্ম সুনির্দিষ্ট। কিন্তু ক্ষাত্রধর্মের পুরোধা যুধিষ্ঠির যুদ্ধক্ষেত্রে স্ববর্ণ নির্দিষ্ট কর্মে পীড়িত বোধ করেন। অর্জুন বা ভীমের ন্যায় যুদ্ধ-অভিলাষী ছিলেন না তিনি। স্বভাবে যেমন তিনি যুদ্ধক্ষেত্র-প্রেমী নন, তেমনি গৃহাশ্রমেও চিরকাল বাঁধা থাকলেন না। শেষ পর্যন্ত আরো বিপুল এক মুক্তির পথে তাঁকে যাত্রা করতে হয়েছিল। আবার, গীতা শুধু অর্জুনের প্রতি বলা হলেও, বেশ কিছু বক্তব্য আগেও আমরা কৃষ্ণের মুখে শুনেছি। সঞ্জয়ের সন্ধি প্রস্তাবকালে যুধিষ্ঠিরের মন সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতে যেসব কথা বলেন উদ্যোগ পর্বে, তা বুদ্ধদেব বলেন তা ‘গীতা’র তৃতীয় অধ্যায়ের ভ্রূণরূপ।

বুদ্ধদেবের যুক্তি ও বর্ণনা অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা উপলব্ধি করি, মহাভারত যুধিষ্ঠিরের আধার, যুধিষ্ঠির মহাভারতের আধার নন। এখানে প্রাবন্ধিকের আলোচনায় আমরা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে মহাভারতের সম্বন্ধ যেমন পাই, তেমনি সেই সম্বন্ধের সীমাও আমাদের জানিয়েছেন তিনি।

গীতার মর্মকে মহাভারতের আখ্যান ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গে সংবদ্ধ করে বুদ্ধদেব বসু মহাভারতের অভিপ্রায় ও যুধিষ্ঠির চরিত্রের সংলগ্নতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের অন্য কয়েকটি নায়ক চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রাবন্ধিক বৈপরীত্য প্রকাশের ইচ্ছায় যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে অডিসেউস, অর্জুন, ভীম ও রামচন্দ্রের মতো পৌরাণিক চরিত্রের তুলনা করেছেন। আমরা অডিসেউসের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের বিপরীতধর্মী পরিণতি, বাহুবলী ভীম বা ধনুর্ধর রোমান্টিক নায়ক অর্জুনের সঙ্গে পার্থক্যের কথা পূর্বে আলোচিত। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুনিধনে এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ। এবার রামচন্দ্রের বিষয়ে দেখলে দেখব তাঁর মন বালীবধ, সীতাবর্জন, শম্বুকহত্যার মতো নিষ্ঠুর কর্মেও বিচলিত হয়নি। এর বিপরীতে আমরা যুধিষ্ঠির নামক পৌরাণিক চরিত্রে দেখলাম আধুনিক সাহিত্যের মনস্তত্ত্ব, যেখানে প্রাবন্ধিক দেখালেন গীতার অমৃতবাণীর সাহায্যে কুলধর্ম ও স্বভাবধর্মের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের অন্তর্ধান।

প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু প্রথমে সংগতভাবে রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায় উপন্যাসের নায়ক অতীন বা অন্তুর কথা মনে করালেন আমাদের। বিদেশি ও বিধর্মী শাসকদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের পথ দেখায় গীতার বাণী যা পরাধীন ভারতের স্বাধীনতাকামী সন্ত্রাসবাদী দলের

© Santiniketan Sahityapath

জন্য মানসিক হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছিল। কিন্তু অতীন ছিল কবি, সে অভিজাত-বংশীয়। সন্ত্রাসের ভয়াল পথে সে নেই তার এইস্বভাবধর্মে। সে এই পথের পথিক হয় এলার প্রতি প্রেমের টানে। এলা বিপ্লবিনী। তাই প্রহর শেষের রাঙা আলোয় সে এলার চোখে দেখেছিল তাদের প্রেমের সর্বনাশ এবং এলার জীবনের পরিণতি। দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে নেতার আদেশে অতীন এলাকে যখন গুলি করে মারতে বাধ্য হলো, তখন স্বধর্মচ্যুত অতীনের নৈতিক পতন থেকে এই উত্তরণের পথ রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেখান নি।

অতীনকে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি যুধিষ্ঠিরের আদর্শে সৃষ্টি করেন নি। সম্পূর্ণ তুলনা দিতে বুদ্ধদেব বেছে নিলেন এক আধুনিক এপিক উপন্যাসের অংশ — টলস্টয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি'। 'চার অধ্যায়' আলোচনায় কয়েকটি মূল অংশের অবতারণা করে যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। কিন্তু 'যুদ্ধ ও শান্তি'র ক্ষেত্রে প্রধানত একাদশ খণ্ড থেকে উপসংহার পর্যন্ত কিছু কিছু প্রসঙ্গ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

টলস্টয়ের উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রে দুই পুরুষ, প্রিন্স আন্দ্রেই এবং কাউন্ট পিয়ের বেজুখ হব। বুদ্ধদেব বলেছেন —

> **তাদের মধ্যে একজনের নাম পিয়ের বেজুখয়, জনাকীর্ণ 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসের প্রধানত পুরুষচরিত্র বলতে তাকেই আমাদের মনে পড়ে। আগে আমরা তাকে দেখেছি এক ধনী, কৃতবিদ্যা, চিন্তাশীল ও অবিন্যস্ত স্বভাবের যুবক, সেন্টপিটার্সবার্গও মস্কোর অভিজাত সমাজে ঘূর্ণমান।**[১৮]

প্রাবন্ধিক এখানে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনাতে পিয়ের বেজুখয়-এর আন্তিক পরিণতির দিকেই মনোনিবেশের দায়িত্ব দিয়েছেন। প্রসঙ্গের খাতিরে বুদ্ধদেব নিজের বক্তব্যের বহিঃপ্রকাশ করেছেন বিক্ষিপ্তভাবে। এর কারণেই পিয়েরের আত্মিক পরিণতি আমাদের কাছে পরিষ্কার নয় এবং এক বিপরীত বিকৃতরূপ নিল। তা বুদ্ধদেবের সিদ্ধান্তকে অপূর্ণতা ও ভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়।

'যুদ্ধ ও শান্তি'তে নেপোলিয়নের রুশ অভিযান এবং মস্কো থেকে তাঁর পিছু হটে যাওয়ার কাহিনি ও পরাজয় বর্ণিত হয়েছে। সেই যুদ্ধে কোনো সংগ্রামী সৈন্যদলে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেয়নি বেজুখহু। ভয়াবহ যুদ্ধের তিনি দর্শকমাত্র। নেপোলিয়ানের আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদকে তিনি ঘৃণা করতেন রুশ আক্রমণের কাল থেকে। নেপোলিয়ান মস্কো অধিকার করলে, যাদের কিছুমাত্র সংগতি ছিল তারা সেই শহর ত্যাগ করল। ফরাসি কাহিনি মস্কো-প্রবেশকালে শহরে তখন সহায়সম্বলহীন কিছুমাত্র লোক উপস্থিত। আর উপস্থিত ছিল অভিজাত কাউন্ট বেজুখয়। কাণ্ডজ্ঞানহীন সেই যুবকের অভিসন্ধি ছিল নেপোলিয়ানকে হত্যা করা, তাই সে পোশাকের আড়ালে পিস্তল আর ছোরা নিয়ে ঘুরছিল। তার অবাস্তব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হলেও মস্কোয় পড়ে থাকা গরিবদের জীবনযুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে শুরু হলো তার জীবনের নতুন অধ্যায়। প্রকৃত স্বদেশপ্রেমের শিক্ষা সে পেল এই মানুষদের থেকেই। এইরকম ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন ছেড়ে বনপর্বে যুধিষ্ঠির স্বদেশের হদিশ পেয়েছিল। প্রতিহিংসার কিছু রুশীয় ফরাসী অধিকৃত মস্কোয় আগুন লাগালে দখলকারী ফরাসী সৈন্যরা অকথ্য অত্যাচার চালায়। পিয়েরের পাশে দাঁড়ানো বন্দী শ্রমিক ছেলেটাকে গুলি করে হত্যা করে। তখন পিয়ের যুদ্ধের সেই রহস্যময় সহানুভূতিহীন শক্তিকে প্রত্যক্ষ করল। এই দৃশ্যই বিশ্বের শুভ-শৃঙ্খলা। ঈশ্বরের প্রতি সকল বিশ্বাস ধ্বংস হলো পিয়েরের অন্তর থেকে। বন্দীদলের এক চাষী বয়স্ক লোকের মানবিক ব্যবহার ও ভূয়োদর্শনের কথা তার ঈশ্বরে বিশ্বাসকে ফিরিয়ে দেয়। বন্দীদশা পিয়েরের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়, যুধিষ্ঠিরের বনপর্বের মতো। কিন্তু পিয়েরের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের এমন তুলনার প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব কিছু বলেন নি। তিনি প্রথমে জানালেন অভিজাত বেজুহফের বেশ ভালোই লাগছিল ওই অনভ্যস্ত রুক্ষ জীবনের নতুনত্ব। যেখানে —

> **সে আর চিন্তা করছে না, শুধু অনুভব করছে।... ভালো লাগছে অশ্বমাংসের অজ্ঞাতপূর্ব আস্বাদ, সারাদিন পায়দল চলার পর রাত্তিরে অন্যদের সঙ্গে গোল হ'য়ে ব'সে আগুন পোহানো, ... এক দুর্দান্ত জীবনলিপ্সা তাকে অধিকার করে নিয়েছে।**[১৯]

প্লাতোন কারাতেভের নাম কোথাও উল্লেখ করেন নি, শুধু বৃদ্ধ সাধুস্বভাব বন্দীটি পিয়ের বেজুহফকে ঈশ্বরের প্রতি আস্থা ফেরাতে সাহায্য করছে বুদ্ধি দিয়ে নয়, সমগ্র সত্তা দিয়ে। কারাতেভের শিক্ষাতেই সে বুঝেছে জীবন সব, জীবনই ঈশ্বর।

জনতার মাঝে মিশে-যাওয়া বেজুহফের শিক্ষালাভ এবং কারাতেভের সঙ্গে তার সম্পর্কের দিকে যখনই নিবিষ্ট চোখ রাখি তখনই 'যুদ্ধ ও শান্তি'র কেন্দ্রস্থলে বেজুহফের একক ব্যক্তিত্বের বদলে তার স্বদেশ, বিশেষত মস্কো আমাদের ফোকাসে আসে। এর সমান্তরাল ভাবনা মহাভারতে নিলে বুঝি যুধিষ্ঠিরও এভাবে তাঁর স্বদেশকে খুঁজেছিলেন বনপর্বে।

© Santiniketan Sahityapath

বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'মহাভারতের কথা' প্রবন্ধে ভারতসন্ধানে কথা ভেবেছিলেন। অন্তহীন অরণ্যের রূপ নির্ণয় করেন, নাম দেন 'ভারত সংহিতা'। 'ভারত' অর্থে সেখানে ভরতবংশ — ভারতবর্ষ দুই-ই বোঝায় এবং 'সংহিতা' অর্থে সংগ্রহ। ওই সংহিতা যেন 'সর্বগ্রাহী নির্বিচার ভাণ্ডার', তার মূল শৃঙ্খলাকে উপলব্ধি করতেই মূল নায়কের সন্ধানের সঙ্গে উন্মোচন হবে মহাভারতের আখ্যান। যুধিষ্ঠিরের চরিত্রকে সুস্পষ্ট করতে গিয়ে ভারতবর্ষ তাঁর দৃষ্টিতে অস্পষ্ট হয়ে গেল।

বেজুহফ বহু মানুষের সংস্পর্শে যা শিখেছিল, যুধিষ্ঠির বনপর্বে তাই শিখেছিলেন। কোনো একক সান্নিধ্য নয়, বহুর সাহচর্যই বেজুহফকে যুদ্ধপরবর্তী সাধারণ ও উত্তেজনাহীন জীবনে সার্থকতা এনে দিয়েছিল। বুদ্ধদেব এই ব্যাপারটি লক্ষ করেছিলেন। তিনি টলস্টয়ের বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন —

> **তিনি আমাদের বলতে চাচ্ছেন: 'দ্যাখো-এই স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, অতি সাধারণ, অতিদৈনন্দিন... এরাই আসল, সবযুদ্ধ ও বিপ্লব ও ঐতিহাসিক আলোড়ন পেরিয়ে এরাই টিকে থাকে... এরাই সভ্যতার আদিসত্য।'? কিন্তু এ-ই যদি টলস্টয়ের বক্তব্য, সেটি উপন্যাসের ভিতর থেকে ঠিক ফুটে ওঠেনি, তাই এর যথার্থ বিষয়ে সন্দিহান না-হ'য়ে আমরা পারি না।**[২০]

বুদ্ধদেবের লক্ষ্যে তা ফুটে ওঠেনি, কারণ বেজুহফের স্বদেশ-সন্ধানের কথা ভুলে তার আত্মিক বিবর্তনে নিবিষ্ট ছিল তাঁর চোখ।

মহাভারতের কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম, কর্ণ, দ্রৌপদী, কুন্তী এমনকি শকুন্তলা ও দুষ্মন্তকে নিয়ে কালিদাস, ভারবি, ভাস প্রমুখ সংস্কৃত মহাকবি এবং বাংলার বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মহান লেখকেরা কাব্য-নাটক-জীবনচরিত রচনা করেছেন। যুধিষ্ঠিরের মতো নিরীহ এবং নিষ্প্রভ চরিত্রকে ঘিরে ব্যাস-পরবর্তী কোনো সাহিত্যিক কিছু লিখলেন না। অথচ তাঁর সঙ্গে মহাভারতের ধর্মজিজ্ঞাসার সম্পর্ক অতি গভীর। বুদ্ধদেব বসু সেই অভাব সুষ্ঠুভাবে পূরণ করলেন। মহাভারতের কর্মকাণ্ডকে ঘিরে এতক্ষণ সব আলোচনা হলো, তবে মৌষল পর্বে মহাভারতের পার্থিব ঘটনা শেষ হওয়ার পরও 'মহাপ্রাস্থনিক' ও 'স্বর্গারোহণ'এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিও আলোচনার যোগ্য।

বুদ্ধদেব বসু যে সমস্ত প্রাচীন বা আধুনিক সাহিত্যের নায়কের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের তুলনা করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকে কাহিনির পরিশেষে ঘরে ফিরেছেন। যুধিষ্ঠিরের অসমধর্মা রামচন্দ্র ফেরেন অযোধ্যায় এবং অডিসেউস ফেরেন ইথাকায়। আর সমধর্মা বেজুহফ গৃহাশ্রমে ফিরে শান্তি পায়। কিন্তু যুধিষ্ঠির শুধু ঘর নয়, ভারতবর্ষও ছাড়লেন, মৃত্যু পথযাত্রী হলেন। যুধিষ্ঠিরের সনাতন ধর্মে সংসারী মানুষ ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ জীবন অতিবাহিত করতে পারে। তবু পাণ্ডব ও দ্রৌপদীর শেষ পরিণতি দেশত্যাগ ও মৃত্যুবরণ। হয়তো তাঁরা থাকার মতো দেশ আর পান নি। যে ধর্মরাজ্য প্রতিস্থাপনের মহাযজ্ঞের ঋত্বিক কৃষ্ণ ও যজমান যুধিষ্ঠির, যজ্ঞ শেষে দেখা গেল যজ্ঞানলে আহুতি দান করা হয়েছে সেই দেশ-সমাজকে। শেষে পড়ে আছে কেবল ভস্ম।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে যুধিষ্ঠিরের মনে অনুতাপের দুটি পর্যায় আমরা লক্ষ করি। প্রথম পর্যায়ে, শান্তিপর্বে তাঁর উত্তরাধিকারী দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও অভিমন্যুকে হারানো জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণকে অজ্ঞানবশত হত্যা, অশ্বমেধ পর্বে ভীষ্মের মৃত্যুর অনুতাপের কারণ। তারপর রাজ্যশাসনের ভার নিয়েছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কুরু-পাঞ্চালের যুদ্ধ, কুরু-পাণ্ডবের নয়। ইন্দ্রপ্রস্থের হৃতরাজ্য উদ্ধারে পাণ্ডবেরা তাদের মামাতো ভাই কৃষ্ণকে নিয়ে বৈবাহিক সম্পর্কে আত্মীয় এবং কৌরবদের প্রতিপক্ষ পাঞ্চালদের দলে যোগ দেয়। দুর্যোধন বিনাযুদ্ধে সূচাগ্র মেদিনীর অধিকার থেকে বঞ্চিত করায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সূচনা হয়। যুদ্ধশেষে ধার্তবংশে দাসীপুত্র যুযুৎসু ছাড়া আর পাণ্ডব বংশে উত্তরার গর্ভস্থ সন্তান ছাড়া কেউ রইল না। যুধিষ্ঠিরের মিত্রপক্ষে ছিল কেবল কৃষ্ণ ও তাঁর যদুবংশ।

আশ্রমবাসিক পর্বে যুধিষ্ঠির বনবাসিনী কুন্তীর কাছে তাঁর মনস্তাপের দ্বিতীয় পর্যায় ব্যক্ত করেন। পৃথিবী লোকশূন্য হওয়ার কারণে, তার প্রতিপালনে যুধিষ্ঠির আগ্রহ হারান। স্বজন-বন্ধুহারা হয়ে ধর্ম-সাধনার পথে হাঁটতে চেয়েছেন। আশ্রমবাসে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর একে একে সকলে প্রয়াত হন। মৌষল পর্বে যদুবংশ ধ্বংস হয়, স্বয়ং কৃষ্ণও। ভারতবর্ষে যুধিষ্ঠির ও বাকি পাণ্ডবদের মানসিক অবলম্বন কিছুই রইল না। নিঃসঙ্গ যুধিষ্ঠিরের জীবনে ধর্মের প্রভাব ও আদর্শ বিশেষভাবে জড়িয়ে ছিল, তা বুদ্ধদেব বসু লক্ষ করেন। বনপর্বে ধর্ম এসেছিলেন জলবাসী যক্ষরূপে, অশ্বমেধপর্বে যুধিষ্ঠিরের দানসভায় আসেন এক নীলচক্ষু নকুলরূপে। যুধিষ্ঠিরের স্বভাবধর্ম যে ধীরে ধীরে রাজ্য ত্যাগের দিকে বিবর্তিত হয়েছে, তা এই নীলচক্ষু নকুলের আখ্যান থেকে স্পষ্ট পরিস্ফুট। পাণ্ডবকুলের ক্ষমতা হ্রাস হতে থাকে, শেষে তা লোপ পায় এবং সর্বভূক হুতাশনই তাদের সমস্ত ক্ষমতার চিহ্ন লোপাট করে — বুদ্ধদেব একথা আমাদের বলেন।

© Santiniketan Sahityapath

শুরুটা হয়েছিল খাণ্ডব বন দহনে আগুনকে সহায়তা দান করার সময়; তারপর যুদ্ধশেষে অর্জুনের রথকে ধ্বংস করেন অগ্নি; বনমধ্যে প্রাণ হারাণ দাবানলে ধৃতরাষ্ট্র, কুন্তী, গান্ধারী। অর্জুন তাঁর গাণ্ডীব অগ্নির নির্দেশে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করেন। এরপর পাণ্ডবরা বেরিয়েছিলেন মহাপ্রস্থানের পথে।

মহাপ্রাস্থনিক পর্বের শুরুতে আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখি মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই কামনা করেন নি যুধিষ্ঠির। তাঁর এই সংকল্প শুনে বাকি পাণ্ডবেরা এবং দ্রৌপদী ও প্রাণত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ করে রাজ্য ত্যাগ করেন। কৌরব সিংহাসনে অভিষিক্ত হন উত্তরার গর্ভজাত অভিমন্যু তনয় পরীক্ষিত, তাঁর শিশু বয়সে রাজ্যপালনের ভার থাকে যুযুৎসুর ওপর। যাদবদের একমাত্র বংশধর কৃষ্ণপৌত্র বজ্রের ওপর ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনের দায়িত্ব দিয়ে তাঁরা রাজ্য ত্যাগ করেন।

'যুদ্ধ ও শান্তি'র প্লাতোন কারাতেভ তার শেষ সময়ে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমাস্বরূপ চেয়েছিল মৃত্যু, তেমনি পাণ্ডবরাও তাদের শেষ যাত্রায় মৃত্যু ছাড়া কিছুই প্রার্থনা করেন নি। কারাতেভের সঙ্গী ছিল কুকুর, আবার হস্তিনাপুর ত্যাগের সময় থেকেই ধর্ম ছদ্মবেশ ধারণ করে কুকুর রূপেই যুধিষ্ঠিরের সঙ্গী হয়েছিলেন। ধর্মকে আমরা মহাভারতের পাতায় বারবার দেখেছি মনুষ্যেতর প্রাণী হিসেবে। যে, সরল ও নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত। সেখানে নেই ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের অস্থিরতা। নতুন অভিজ্ঞতা যেমন ব্যক্তির স্বভাবে নতুন বৈচিত্র্য আনে, ধর্মও তেমন মহাভারতে রূপ পরিবর্তন করেছে সরল আকৃতিকে নির্ভর করে।

পাণ্ডবদের সপরিবারে মৃত্যু মুখে যাত্রাকে বুদ্ধদেব সন্ন্যাস গ্রহণ বলে স্বীকার করেন নি। সমগ্র ভারতবর্ষের উপকূলভাগ প্রদক্ষিণ করেও তাঁদের গন্তব্য অনিশ্চিত। তাঁরা এরপর পৃথিবী পরিক্রমার ইচ্ছায় উত্তরদিকে গমন করেন। বুদ্ধদেব আমাদের জানিয়েছেন — "মহাপ্রস্থানের পরিকল্পনা যুধিষ্ঠিরের, ঘটনাটির অনুষ্ঠাতাও তিনি।"[২১] তাকে সকল পাণ্ডব ও দ্রৌপদী অনুসরণ করেছিল। এমনকি কুকুররূপী ধর্মও চলেছিলেন যুধিষ্ঠিরের পদচিহ্ন ধরে। যুধিষ্ঠির কাউকে অনুসরণ করেনি। দ্রৌপদী-সহ চার পাণ্ডব একে একে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। খুব সাধারণ মৃত্যু। থামলেন না যুধিষ্ঠির, তাকালেন না পর্যন্ত। সহযাত্রী কুকুরকে সঙ্গী করে দুর্গম পথের যাত্রী যুধিষ্ঠির। এরপর ইন্দ্রের রথ তাকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যেতে এলে সঙ্গী কুকুরকেও যুধিষ্ঠির রথে নিতে চাইলেন। ইন্দ্র সেই প্রস্তাবে অস্বীকৃত হলে বহুদিনের পথের সঙ্গীকে পরিত্যাগ করে স্বর্গে যেতে যুধিষ্ঠিরও অসম্মত হলেন।

প্রত্যাখ্যান স্বর্গ যুধিষ্ঠিরের জীবনে এক নব আদর্শের বাণীস্বরূপ প্রকাশিত হলো, যেন বিবেকানন্দের মহৎ বাণী 'জীবে প্রেম' ধ্বনিত হলো। মৃত্যুমুখী কারাতেভের জীবনের বিষয়ে পিয়েরের উদ্বেগহীনতাকে বুদ্ধদেব বসু করুণাহীন ও অ-খ্রিস্টান ভেবেছিলেন। তেমনি ছিল ইন্দ্রের প্রশ্ন যুধিষ্ঠিরের জন্য। চার ভাই ও স্ত্রীর মৃত্যু তাকে বিচলিত করেনি, তবে কুকুরের জন্য উদ্বেগের কারণ কী? যুধিষ্ঠির জানায়, ইহলোকের মৃতের সঙ্গে মিলন বা দ্বন্দ্ব সম্ভব নয়, সম্ভব নয় জীবন দানও। তাই তাদের ত্যাগ করেছে সহজে। জীবিত অবস্থায় যুধিষ্ঠির তাদের ছেড়ে যায়নি, এখন এই আশ্রিত জীবকেও সে পরিত্যাগ করতে পারবে না। যুধিষ্ঠিরের এই বাক্যেই ধর্ম তার স্ব-রূপে, স্ব-মহিমায় প্রকাশিত হয়ে যুধিষ্ঠিরের দয়াধর্মকে অভিনন্দিত করলেন।

দেবযানে আরোহণকালে ধর্ম প্রীত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে জানান, বনপর্বে বকরূপে তিনি কোনো একজন পাণ্ডবকে প্রাণদান করবেন, তখন যুধিষ্ঠির নকুলকে বেছে নেওয়ায় তাঁর ধর্মপরায়ণতা প্রকাশ পায়। কিন্তু যুদ্ধশেষে যুধিষ্ঠিরের মনস্তাপে কৃষ্ণ যে আত্মকেন্দ্রিক নঞর্থক ধর্মবোধ যুধিষ্ঠিরের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন, তা মহাভারতের শেষে এসে সর্বভূতে ক্রিয়াশীল সমস্ত জীবে প্রেম ধর্মে স্থিতি ও শান্তি পেল। বুদ্ধদেব কিন্তু এসব বিষয়ে বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নি। তিনি আমাদের দেখালেন —

> **আমরা যারা মর্তভূমির মরণশীল মানুষ। সব যুদ্ধ থেমে যাবার পর এবং সব আশ্রয় ভেঙে যাবার পর আমাদের জীবনে যা অবশিষ্ট থাকে, যা কেউ দান করেনি আমাদের কিন্তু আমরা নিঃসঙ্গভাবে নিভৃত চিত্তে উপার্জন করেছি আমাদের সেই শেষ সম্পদের প্রতীকরূপে, কোনো দুর্লভ অথচ প্রাপনীয় সার্থকতার প্রতিভূরূপে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে চিরকালের মতো বাসা বাঁধলেন যুধিষ্ঠির-ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন তাঁকে তুলে নিয়ে ইন্দ্রের রথ আমাদের পক্ষে অগম্য ধামে মিলিয়ে গেলো।**[২২]

স্বর্গে পৌঁছে যুধিষ্ঠির দেখলেন, কুরুক্ষেত্রের সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ হারানো দুর্যোধন প্রমুখ ধার্তরাষ্ট্রগণ বীরলোকে বিরাজমান। কিন্তু ন্যায়বান পাণ্ডব-ধর্মচারিণী দ্রৌপদী-মহাবীর কর্ণ কেউ সেখানে নেই। তাঁরা সকলেই নরকবাসী। যুধিষ্ঠির তাই স্বর্গবাস ত্যাগ করে জীবনে

© Santiniketan Sahityapath

যাঁদের ভালোবাসতেন তাঁদের সঙ্গো এই নরকেই তিনি থাকতে চাইলেন। এর দ্বারাই যুধিষ্ঠিরের প্রেমধর্ম প্রকাশিত। তাঁর এই কথা উচ্চারণ মাত্র মায়া নরক অন্তর্হিত হয়। অশ্বত্থামার বিষয়ে মিথ্যা বলার জন্য তাঁর এই নরকদর্শন অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাঁর প্রিয়জনেরা সকলেই নিজের কর্ম অনুযায়ী অভিষ্ট দেবলোকে স্থান পেয়েছেন। এই ছিল যুধিষ্ঠিরের শেষ পরীক্ষা।

বুধদেব বসু 'মহাভারত'কে সংহিতা বা সংগ্রহ গ্রন্থরূপেই গ্রহণ করেছেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে মহাভারতের প্রকৃত নায়ক হিসেবে দেখেছেন। কোন্ সূত্রে যুধিষ্ঠিরের নায়কত্ব, তা তিনি শুরুতেই দেখিয়েছেন বক বা যক্ষরূপে মূর্ত ধর্মের প্রশ্ন সম্মুখীন পঞ্চপাণ্ডবদের আখ্যানে। তারপর সারা গ্রন্থ জুড়ে 'মহাভারত'এর সব প্রসঙ্গোর সঙ্গো যুধিষ্ঠির চরিত্রের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ এবং উভয়ের সহমুখী প্রগতি প্রাবন্ধিকের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়।

তথ্যসূত্র:

১। 'মহাভারতের কথা', বুদ্ধদেব বসু, 'মুখবন্ধ', এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৩৮১ (অতঃপর 'মহাভারতের কথা' নামে উল্লিখিত)

২। ওই

৩। আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবার ১৭ মার্চ ২০২৪, রবিবাসরীয়, শুভাশিস চক্রবর্তী, পৃ. ৪

৪। ওই, পৃ. ৪

৫। 'মহাভারতের কথা', 'বনবাসের শেষ দিন', পৃ. ২০

৬। ওই, 'এক অন্তহীন অরণ্য', পৃ. ২৪

৭। 'কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত সারানুবাদ', রাজশেখর বসু, 'ভূমিকা', এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ত্রয়োদশ মুদ্রণ ১৪১৮

৮। ওই

৯। 'মহাভারতের কথা', 'মূলকাহিনী', পৃ. ৩৭

১০। ওই, 'গোত্র বিচার', পৃ. ২৬

১১। ওই, 'নায়ক সন্ধানে', পৃ. ৪১

১২। ওই, 'কোন বীর, কোন দেবতা...', পৃ. ২১৪

১৩। ওই, 'গোত্রবিচার', পৃ. ২৯-৩০

১৪। ওই, 'এক বিশ্ববিদ্যালয়', পৃ. ৪৯

১৫। ওই, 'অর্জুন ও যুধিষ্ঠির', পৃ. ৯৯-১০০

১৬। ওই, 'মূলকাহিনী', পৃ. ৩৯

১৭। ওই, 'যুধিষ্ঠির ও অর্জুন', পৃ. ১০৫

১৮। ওই, 'পশ্চিম সমুদ্র ও হিমালয়', পৃ. ১৬৮

১৯। ওই, পৃ. ১৬৮-১৬৯

২০। ওই, পৃ. ১৭৩-১৭৪

২১। ওই, 'শেষ যাত্রা', পৃ. ২৭১

২২। ওই, পৃ. ২৭৮

Prantik Gabeshana Patrika